বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩১/ডিসেম্বর ২০২৪

কাজী নজরুল ইসলামের নন্দনতাত্ত্বিক দর্শন

মুনিরা সুলতানা*

সারসংক্ষেপ

নন্দনতত্ত্ব মূলত দর্শনেরই একটি প্রাচীন শাখা। নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসায় সৃজন, সৌন্দর্য ইত্যাদি বিষয়ক ধারণা ও তার বৈচিত্র্য রয়েছে। প্রত্যেক শিল্পীর স্বতন্ত্র নান্দনিক চেতনা এই বৈচিত্র্যের মুখ্য কারণ। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সৃষ্টিজগতের মধ্য দিয়ে নির্মাণ করেছেন এক স্বতন্ত্র নন্দনতাত্ত্বিক দর্শন। প্রসঙ্গক্রমে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নন্দনতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা উপস্থাপিত হয়েছে এখানে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পভাবনার ক্রম-উৎকর্ষ ও রূপান্তরের ইতিহাসের সাথে কাজী নজরুল ইসলামের নন্দনভাবনার সম্পর্ক কিংবা বিলগ্নতার অধ্যয়ন এই প্রবন্ধের অন্যতম অন্বেষা। সেই সঙ্গে নজরুলের নন্দনচিন্তার স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য অনুসন্ধানও এ রচনার লক্ষ্য।

চাবি শব্দঃ কাজী নজরুল ইসলাম, নন্দনতত্ত্ব, দর্শন, শিল্প, সমাজ, মানববাদ, উত্তর-উপনিবেশবাদ।

সৌন্দর্যতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন শিল্পাঙ্গিকের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নকেই নন্দনতত্ত্ব বলে। ইংরেজি 'Aesthetics'-কে সৌন্দর্যতত্ত্ব বা 'সৌন্দর্যের বিজ্ঞান' বলা হয়েছে। কিন্তু 'নন্দনতত্ত্ব' শব্দটি 'Aesthetics' কিংবা 'Poetics'-এর ভাবানুবাদ কিনা এ বিষয়ে ঐকমত্য নেই। 'অক্সফোর্ড ডিকশনারি' বা 'অক্সফোর্ড ল্যাঙ্গুয়েজেস'-এর সূত্র[১] অনুযায়ী 'Aesthetics' শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Aisthetikos' থেকে এসেছে, যার আদি রূপ ছিল 'Aisthesthei' (ইংরেজি perceive অর্থে), পরবর্তীকালে যথাক্রমে 'Aisthēta' (perceptible things) এবং 'Aisthetikos' (perception by sense); সুতরাং ইন্দ্রিয়-উপলব্ধি, সৌন্দর্য ও আনন্দ অনুভব, কিংবা কান্তিবিদ্যাসম্বন্ধীয় জ্ঞানই এস্থেটিকের মর্মকথা। 'সৌন্দর্য' কী এ বিষয়ক বিচার যথেষ্ট প্রাচীন[২] এবং তা দর্শনেরও একটি বড় প্রসঙ্গ। সুন্দরের ধারণায় যুক্ত হয়েছে সত্য ও মঙ্গল বিষয়ক বিশ্লেষণ। কিন্তু এ বিষয়ক জিজ্ঞাসা মীমাংসিত না হয়ে বরং জন্ম দিয়েছে নন্দনতত্ত্বের কিছু দার্শনিক সমস্যার। যেমন– যা সুন্দর তা 'সাবলাইম' কিনা; যা অপূর্ব বা মহোত্তম তা লোকোত্তর কিনা, যা লোকোত্তর তা উপযোগী কিনা; যা উপযোগী তা সত্য কিনা ইত্যাদি। ইংরেজ তাত্ত্বিক রেমন্ড উইলিয়ামস্ (১৯২১-১৯৮৮) তাঁর *Keywords: a Vocabulary of Culture and Society* (১৯৭৬) গ্রন্থে মত প্রকাশ করেন যে, 'Aesthetics' শব্দটি ইংরেজি ভাষায় উনিশ শতকেই প্রথম দেখা দেয়, তার আগে এর প্রচলন

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ছিল না, ল্যাটিনে আলেকজান্ডার বাউমগার্টেন (১৭১৪-৬২) *Aesthetica* (১৭৫০) নামে দু খণ্ডের একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্ব হলো তিনি 'Aesthetics' শব্দটিকে প্রথম প্রয়োগ করেছেন। রেমন্ড উইলিয়াম্ বলেন যে, 'Aesthetics' শব্দটি শিল্পের কখনও দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রতিমার, কখনো অসাধারণ এবং সুন্দরের বিশেষ রেফারেন্স হিসেবে ইতিহাসের বিভিন্ন মুহূর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। এরই সঙ্গে শব্দটি গুরুত্ব দিয়েছে মন্ময়তাকে, মন্ময় অনুভূতির সক্রিয়তাকে শিল্প ও সৌন্দর্যের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে এ দুটোকে তার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।[৩] আধুনিক চৈতন্যে শিল্প আর সমাজের মধ্যে যে বিরোধ, দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য তৈরি হয়, তার মূলেও 'Aesthtic' শব্দের বিশেষ ঐতিহাসিক কার্যকারণ জড়িত। উনিশ শতকে নান্দনিকতাবাদ মূলত আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

ক.

শিল্প বা সাহিত্য কী, কী এর সৃজন প্রক্রিয়া, এটা কি কেবল আবেগের অভিব্যক্তি নাকি ইতিহাস, বুদ্ধিবৃত্তি ও মননের সংযোগ, এর উদ্দেশ্যই বা কী, শিল্পের সাথে সৌন্দর্যসৃষ্টির কী সম্পর্ক– এসব জিজ্ঞাসা ঘিরে বস্তুবাদী ও ভাববাদী বিভিন্ন মতাদর্শ বিকশিত হয়েছে। নন্দনতত্ত্বে রোমান্টিকতা ও কলাকৈবল্যের ধারণা প্রযুক্ত হয় আঠারো-উনিশ শতকে ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের রচনায়। বিশেষত উইলিয়াম ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০), স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪), শেলী (১৭৯২-১৮২২), জন কিট্স (১৭৯৫-১৮২১) প্রমুখের রচনায় শিল্প-সাহিত্য বিশেষত কবিতা বিষয়ক বোধ প্রকাশিত হয়েছে। রোমান্টিক শিল্পতত্ত্বের মধ্য দিয়ে আঠারো শতকের নব্য-ধ্রুপদী নন্দনভাবনা[৪] ও যুক্তি-বুদ্ধি-প্রকরণশাসিত নগরজীবন-নির্ভর কাব্য-কবিতার বিরুদ্ধে আবেগ ও হৃদয়বৃত্তির এক দ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। কবিতা বা শিল্পকর্মকে কেবল বাহ্যিক ও প্রাকরণিক গুণাগুণের নিরিখে বিচার করার বদলে সৃজনের রহস্যপ্রক্রিয়া ও তার উদ্দেশ্য নিয়ে অনুসন্ধানে উদ্যোগী হয়েছিলেন রোমান্টিক কাব্যান্দোলনের প্রবক্তারা। শিল্পসৃজনকে মানুষের জীবনের আদ্য প্রেরণা হিসেবেও চিহ্নিত করেন তাঁরা। ইংল্যান্ডে নান্দনিকতাবাদের যে উত্থান ঘটে, তা মূলত ফরাসি প্রভাব ও দেশজ চিন্তাধারার ফল। নান্দনিকতাবাদের মূল প্রত্যয় ছিল শিল্পকলা হবে বিশুদ্ধ– শিল্প উপভোগ ও বিবেচনার ক্ষেত্রে জীবন, নৈতিকতা ধর্ম ইত্যাদি প্রসঙ্গের উল্লেখ অবান্তর। ভিক্টোরীয় পর্বের শেষে ইংরেজ কবি সুইনবার্ন (১৮৩৭-১৯০৯) 'শিল্পের জন্য শিল্প' মতবাদে দীক্ষিত ও প্রতিশ্রুত ছিলেন। ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়ার (১৮২১-১৮৬৭) সুইনবার্নকে প্রভাবিত করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষে ফ্রান্সের চিত্র অন্দোলন, রাশিয়া ও বেলজিয়ামের কবিতা ও অন্যান্য শিল্প-সংস্কৃতির উৎস ছিল প্রতীকবাদ। ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে ফরাসি প্রতীকবাদী নান্দনিকতাকে স্টিফেন মালার্মে (১৮৪২-১৮৯৮) ও পল ভারলেইন (১৮৪৪-১৮৯৬) উচ্চমাত্রায় নিয়ে যান। প্রতীকবাদী কবিদের ওপরে বোদলেয়ারের প্রভাবও ছিল গভীর।

ভিক্টোরীয় যুগের রোমান্টিক কাব্যধারা থেকে উত্তরিত আধুনিকতাবাদী নন্দনসূত্র নিমার্ণ করেন টি এস এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫)। যেখানে আবেগসর্বস্ব গীতিধর্মিতা থেকে আবেগ-নিরপেক্ষ

নৈর্ব্যক্তিকতায় উত্তীর্ণ হয় শিল্পতত্ত্ব। তাঁর মতে, শিল্পের নৈর্ব্যক্তিকতার সাথে জীবনের অন্তর্গত দাহন যুক্ত হয়ে শিল্পীকে দিয়ে সৃষ্টি করায় ('The man who suffers and the man who creates')। এছাড়া এলিয়টের দৃষ্টিতে 'common speech' (কাব্যে বিপ্লব ও এর যুগচিহ্ন প্রসঙ্গ) আসলে 'colloquial form' যা কাব্যকে 'আধুনিক' অভিধায় অভিহিত করতে সাহায্য করে। 'কাব্যকে এলিয়ট অন্বিত করেন এক সামগ্রিক চিরন্তন সৃষ্টিচক্রের সঙ্গে, যাকে তিনি অভিহিত করেছিলেন কবি বা স্রষ্টার ইতিহাস-চেতনা রূপে।'[৫]

নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক জিজ্ঞাসা দর্শনশাস্ত্রেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে বিবেচিত। এ পর্যায়ে ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬), ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪), ফ্রেডরিক হেগেল (১৭৭০-১৮৩১), ফ্রেডরিক শেলিঙ (১৭৭৫-১৮৫৪), রমা রঁলা (১৮৬৬-১৯৪৪) প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। বিশ শতকে নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যতত্ত্ব বিষয়ে যাঁর মত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তিনি বেনেদিতো ক্রোচে (১৮৬৬-১৯৫২)। ক্রোচে প্রকাশবাদ বা অভিব্যক্তিবাদকে নন্দনতত্ত্বে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আর এই অভিব্যক্তির সঙ্গে ভাষার যোগ অবিচ্ছেদ্য। ক্রোচের দর্শন সজ্ঞা বা অনুভূতিমূলক (intuitive), তাঁর মতে সৌন্দর্যের উপলব্ধি নির্ভর করে সজ্ঞার ওপর।

শিল্পসাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে মার্কসবাদীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মতামত বহুল আলোচিত বিষয়। শিল্পকলার সাথে সমাজ ও শ্রেণিস্বার্থের সম্পর্ক নির্ধারণ করা মার্কসীয় সমালোচনা-শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মার্কসবাদীর কাছে শিল্পসৃষ্টি উদ্দেশ্যনিরপেক্ষ নয়। তাই শিল্প সাহিত্যপাঠের মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে আধার বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরি। যে আধার নির্মিত হয় তিনটি উপাদানের জটিল দ্বান্দ্বিক সংমিশ্রণে– সাহিত্য-আঙ্গিকের বিবর্তনের আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসন, আধিপত্যশীল ভাবাদর্শগত কাঠামো এবং লেখক-পাঠকের পারস্পরিক সম্পর্ক। প্লেখানভ (১৮৫৬-১৯১৮), লেনিন (১৮৭০-১৯২৪), লুনাচারস্কি (১৮৭৫-১৯৩৩), ট্রটস্কি (১৮৭৯-১৯৪০), গিওর্গি লুকাচ (১৮৮৫-১৯৭১), মাও সে তুং (১৮৯৩-১৯৭৬), বাখ্তিন (১৮৯৫-১৯৭৫), ব্রেখট (১৮৯৮-১৯৫৬), থিয়োডর অ্যাডোর্নো (১৯০৩-১৯৬৯), ক্রিস্টোফার কডওয়েল (১৯০৭-১৯৩৭), লুসিয়েন গোল্ডম্যান (১৯১৩-১৯৭০), লুই আলথুসার (১৯১৮-১৯৯০), টেরি ইগলটন (১৯৪৩) প্রমুখের নাম মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লুকাচের নন্দনতাত্ত্বিক ভাবনা মার্কসবাদী শিল্পতত্ত্বে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে, যার মূল সূত্র হলো– সাহিত্য ব্যক্তির জীবনসাধনা হওয়া সত্ত্বেও নান্দনিকতা মূলত সাহিত্যে ব্যক্তিসত্তা ও সর্বজনীন সত্তার মধ্যে অপরিহার্য যোগসূত্র, সমাজ তার প্রেক্ষাপট। মার্কসবাদী দর্শন ইউরোপের দেশে দেশে বিশিষ্ট তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতে নানা চারিত্র্যে প্রকাশিত হয়েছে। তবে শিল্পের সৃজন ও বিচারে মার্কসবাদী চিন্তার প্রধান গুরুত্ব এই যে, এ পর্যায়ে সমাজ পরিবর্তনে সাহিত্যের ভূমিকা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে এবং সমাজ ও ইতিহাস দ্বান্দ্বিক বাস্তবতার পটভূমিতে রেখে সাহিত্য মূল্যায়ন করার রীতিটি জনপ্রিয় হয়।

শিল্পকলা আসলে (প্রত্যক্ষ) অভিজ্ঞতার বিজ্ঞান– এই সূত্রে বিশ শতকের নন্দনতত্ত্ব বিকশিত হয়েছে। নতুন চৈতন্যের আধার হচ্ছে আধুনিক বা উত্তরাধুনিক শিল্পচর্চা। শব্দ, অবয়ব, সংগঠন,

অধিবিদ্যামূলক ডিসকোর্স, বিনির্মাণ ব্যাখ্যান কিংবা প্রতিব্যাখ্যান সমকালীন শিল্পচিন্তার গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। বিশ শতকের নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে সমালোচক বলেন:

> নন্দনতত্ত্বে বিংশ শতকের দিকনির্দেশ ... অন্য যে কোনো কিছুর চেয়ে বেশি শব্দার্থগত দিকনির্দেশনা হয়ে উঠেছে। তবে আমরা যেমন লক্ষ করেছি, চিহ্ন ও প্রতীকের তত্ত্বগুলি যুক্ত হয়েছে বা ব্যবহার করেছে এখন বিজ্ঞান ... যা মূলত প্রত্যক্ষবাদী, যৌক্তিক এবং সহজাত প্রবণতার।[৬]

ভাষার এক গতিময় উৎপাদনশীলতা গুরুত্ব পেয়েছে বিশ শতকের উত্তরপর্বের শিল্প-সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনায়। পূর্বের আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বের অনেক দিকই এ পর্যায়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। রোলা বার্থ (১৯১৫-১৯৮০), লিওতার্দ (১৯২৪-১৯৯৮), মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪), জ্যা বদ্রিয়ার (১৯২৯-২০০৭) ও জ্যাক দেরিদাসহ (১৯৩০-২০০৪) অনেক তাত্ত্বিক তাদের বয়ানের মধ্য দিয়ে শিল্প-সাহিত্য, স্থাপন বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, নৃ-বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্বসহ নানা বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করেছেন। এ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ইন্টারটেক্সচুয়ালিটির ধারণাও, যেখানে প্রতিটি পাঠ অন্যসব পাঠের সাথে সম্পর্কিত।

আঠারো শতক পর্যন্ত ইউরোপে নন্দনতত্ত্বের ধারাবাহিক কোনো ইতিহাস না থাকলেও প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের নন্দনতত্ত্বে বিকাশের ইতিহাস পাওয়া যায় সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের বিকাশের সূত্র ধরে। ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের সাথে ব্যাকরণতত্ত্বের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। ব্যাকরণবিদের শাস্ত্রীয় শৃঙ্খলার মতোই আলংকারিকেরা বাক্য ও পদের মনোহর বিন্যাস ও সৌন্দর্যের কথা বলেন। কাব্যের স্বরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে দেহবাদী আলংকারিকেরা বিভিন্ন প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। কেউ শব্দ ও অর্থগত অলংকারকে, কেউ বাক্যবিন্যাস, কেউ বিশিষ্ট পদরচনারীতিকেই শিল্পের তথা কাব্য রচনার সার্থকতার কারণ বলেছেন। তবে আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত (নবম ও দশম শতক) কাব্যের স্বরূপ বিচার করতে গিয়ে যথাক্রমে ধ্বনি ও রসের ধারণায় উপনীত হন। শব্দ ও অর্থের বাইরে অর্থাৎ বাচ্যাতিরিক্ত অভিব্যঞ্জনার ওপরেই কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভরশীল– এ ধারণা ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বকে নতুন মীমাংসা দিয়েছে। অলংকারবাদীরাও প্রকারান্তরে সিদ্ধ কাব্য সৌন্দর্যের পেছনে অর্থগত অলংকারের গুণের প্রশস্তি করেছেন। বামন থেকে অভিনব গুপ্ত বা আচার্য জগন্নাথ পর্যন্ত ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র মূলত অনেকাংশে বিবর্তিত হয়েছে, ফলে একে অলংকারশাস্ত্র না বলে রসশাস্ত্র বলাই সংগত। অর্থাৎ তা কেবল ইংরেজি Rhetoric বা বাগ্মিতার ভাষাকৌশল নয়।

সাহিত্যের ভাবরস সৌন্দর্য ও আনন্দরূপের পরিচয় রবীন্দ্র-নন্দনতত্ত্বের মূল সুর। রবীন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্য হলো জগৎ ও জীবনসৃষ্টির অপর নাম; ভাবের বস্তুই সাহিত্যের সামগ্রী কিংবা সাহিত্যের প্রকাশ মূলত ভাবরূপে আত্মতারই প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যদর্শনে তাঁর সমগ্র জীবনেরই প্রতিফলন রয়েছে। (দ্রষ্টব্য: *সাহিত্য*, *সাহিত্যের পথে*, *সাহিত্যের স্বরূপ*, *প্রাচীন সাহিত্য*, *আধুনিক সাহিত্য* গ্রন্থভুক্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ)। সুন্দরের সন্ধানে ও সৌন্দর্যতত্ত্ব ব্যাখ্যায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেসব প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার মধ্যে 'সুন্দর', 'সৌন্দর্যের সন্ধান', 'অরূপ না রূপ', 'দৃষ্টি ও সৃষ্টি' 'অসুন্দর' ইত্যাদি প্রবন্ধের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এসব প্রবন্ধে তিনি

সুন্দরকে খণ্ড ও অখণ্ডভাবে দেখেছেন। অর্থাৎ সুন্দরের সঙ্গেই রয়েছে অসুন্দরের ধারণা। বাঙালির নন্দনচিন্তায় ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, তবে এতে পশ্চিমি চিন্তার প্রতিফলনও অলক্ষণীয় নয়।

খ.

কাজী নজরুল ইসলাম মূলত কবি; গল্প-উপন্যাস-নাটক, সংবাদ নিবন্ধ, অসংখ্য গান, প্রবন্ধ ও অভিভাষণের রচয়িতা তিনি। তবে সমস্তের মধ্যেই যা বিকীর্ণ, তা হলো তাঁর অটুট কবিসত্তা। তেইশ-চব্বিশ বছরের সাহিত্যকর্মকালে তিনি মূলত সৃজনমুখর ছিলেন কবিতা ও গান রচনায়। তাঁর সাহিত্যসাধনার প্রেরণা হিসেবে গুরুত্বের সাথে চিহ্নিত হয় তাঁর মানবপ্রেম, মানবিক বঞ্চনা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, স্বাধীনতার প্রশ্নে দ্বিধাহীনতা, স্বদেশপ্রীতি, বিপ্লবের অদম্য আকাঙ্ক্ষা, স্বতন্ত্র সমাজ-রাজনীতিবোধ ও রাষ্ট্রচিন্তা ইত্যাদি।

এ প্রবন্ধের আলোচ্য নজরুলের শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক চিন্তা তথা নন্দনতত্ত্বের দর্শন। এক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য– নন্দনতত্ত্বের দীর্ঘ ইতিহাস ও পরিক্রমার আলোকে নজরুল নন্দনচিন্তা পাঠ। সেদিক থেকে শিল্প-সাহিত্য ও এর সৃজন প্রক্রিয়া সম্পর্কে নজরুলের নান্দনিক অভিজ্ঞতা বা চিন্তাসূত্রের খোঁজ করা প্রয়োজন। সাহিত্য যে মানুষের প্রাণের সৃষ্টি, নন্দনতত্ত্বের এই প্রাচীন অভিমতের সমর্থন রয়েছে নজরুলের রচনায়ও। তাঁর মতে 'সাহিত্যের মুক্ত ধারায় থাকিবে চলার আনন্দ, স্রোতের বেগ এবং ঢেউ-এর কল-গান ও চঞ্চলতা'[৭]; নবীন সাহিত্যিকের রচনায় প্রাণ, চিন্তাশক্তি ফুল্লতা কামনা করেছেন তিনি। তাঁর মতে, ভাবহীন সাহিত্য আসলে সাহিত্য নয়। চিত্তের নির্মলতা ও প্রসারমানতা সাহিত্যের সৃষ্টিশীল শক্তির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত; এ সম্পর্কে নজরুল লিখেছেন : 'যাঁহার চিত্ত যত নিরাবিল, নির্মল, উন্মুক্ত, হাস্যমুখর, তাঁহার লেখাও তত নূতন নূতন সম্পদে ভরা (rich)'[৮] কিংবা 'লেখকের লেখা হইতেছে তাঁহার প্রাণের সত্য অভিব্যক্তি। যেখানে লেখক সত্য, তাঁহার লেখাতে সে-সত্য সত্যভাবেই ফুটিয়া উঠিবে।'[৯] প্রাণের উদারতা ও উন্মুক্ততাকে তিনি বড় মাপের সাহিত্যিকের বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সাহিত্য-সৃজনের সাথে সৌন্দর্য, সত্য, মঙ্গলের ধারণাও সমভাবে চর্চিত হয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বে। নজরুল এ বিষয়ে তাঁর মত প্রকাশ করে বলেন : 'সত্য যদি লক্ষ্য হয়, সুন্দর ও মঙ্গলের সৃষ্টি সাধনা যদি ব্রত হয়, তবে তাঁহার লেখা সম্মান লাভ করিবেই করিবে।'[১০] আর্ট ও সৌন্দর্যসৃষ্টি সম্পর্কে নজরুল লিখেছেন:

> তিনিই আর্টিস্ট, যিনি আর্ট ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। আর্ট-এর অর্থ সত্যের প্রকাশ (execution of truth), এবং সত্য মাত্রেই সুন্দর, সত্য চির মঙ্গলময়। আর্টকে সৃষ্টি, আনন্দ বা মানুষ এবং প্রকৃতি (man plus nature) ইত্যাদি অনেক কিছুই বলা যাইতে পারে; তবে সত্যের প্রকাশই হইতেছে ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।[১১]

আর্টের বিষয়ে নজরুলের এ ধারণায় রোমান্টিক সৌন্দর্যতত্ত্বের উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। সত্য, সুন্দর, মঙ্গল এবং শিল্পসৃষ্টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও এরকম ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যে

সর্বজনীনতা ও স্থায়িত্বের প্রসঙ্গে নজরুল যে চিন্তার পরিচয় দেন, তাতে শিল্পের অমরত্ব তথা সৃষ্টিপ্রবণতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্ট হয়:

> সাহিত্যিক যতই কোন সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করুন না কেন, তাহা দেখিয়াই যেন বিশ্বের যে কোন লোক বলিতে পারে ইহা তাহারই অন্তরের অন্তরতম কথা; ইহা তাহারই বুকে গুমরিয়া মরিতেছিল, প্রকাশের পথ পাইতেছিল না। এই রূপেই বিশ্বসাহিত্য সৃষ্টি হয়, ইহাকেই বলে সাহিত্যে সর্বজনীনতা। ... যাহা বিশ্বসাহিত্যে স্থান পায় না, তাহা স্থায়ী সাহিত্য নয়, খুব জোর দুদিন আনন্দলাভের পর তাহার মৃত্যু হয়। আমাদিগকে তাই এখন করিতে হইবে– সাহিত্যে সর্বজনীনতা সৃষ্টি। অবশ্য, নিজের জাতীয় ও দেশীয় বিশেষত্বকে না এড়াইয়া, না হারাইয়া।[১২]

লক্ষণীয় যে, নজরুল সর্বজনীনতার সাথেই গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন দেশীয় ও জাতীয় বিশেষত্বকে। দেশের ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেই নজরুল সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। ঐতিহ্যবোধ মূলত এমন একটি উপলব্ধির ক্ষমতা, যা শুধু অতীত নয় বরং বহন করে অতীতের বর্তমান উপস্থিতিও। এই ঐতিহাসিকবোধ একইসাথে চিরন্তনের এবং সমসাময়িকের। নজরুলের শিল্পকৃতি ও শিল্পস্বভাবে এই ঐতিহ্যবোধ দৃঢ়।

কবিকে নজরুল আখ্যা দেন রূপরসিক হিসেবে যিনি রূপ বা সৌন্দর্য কেনেন হৃদয় দিয়ে। কিন্তু এই সৌন্দর্য সৃজনের সাথেই রয়েছে বেদনার গূঢ় সম্পর্ক। শিল্পের উদ্দেশ্য আনন্দ এবং কবির প্রণোদিত আনন্দ-ইচ্ছাকে 'সৃষ্টির বেদনাময়তা'[১৩] দিয়ে কবি তাঁর সৃষ্টিকর্মে রূপান্তরিত করেন। তাঁর শিল্পসত্তার এ ধরনের ব্রতও যেন এই আনন্দ-বেদনার সমন্বিত সৃজন। তাঁর ভাষ্য : 'জীবন আমার যত দুঃখময়ই হোক, আনন্দের গান বেদনার গান গেয়ে যাব আমি, দিয়ে যাব আমি নিজেকে নিঃশেষ করে সকলের মাঝে বিলিয়ে, সকলের বাঁচার মাঝে থাকব আমি বেঁচে।'[১৪] কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা একটা চিঠিতে নজরুল এ প্রসঙ্গে আরও লিখছেন: 'আর, মনে হচ্ছে, ছোট্ট দুটি কথা– 'সুন্দর ও বেদনা'। এই দুটি কথাতেই আমি সমস্ত বিশ্বকে উপলব্ধি করতে পারি। 'সুন্দর' ও 'বেদনা' এই দুটি পাতার মাঝখানে একটি ফুল–বিকশিত বিশ্ব।'[১৫] সুতরাং সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা ও রূপদান করার প্রবণতা সাহিত্যস্রষ্টা বিশেষত কবির ভেতরে প্রচ্ছন্ন থাকে। রোমান্টিক কবি কিট্‌সের (১৭৯৫-১৮২১) সত্য-সুন্দরের সাহিত্যিক সমীকরণের যে নান্দনিকতা, তা নজরুল অতিক্রম করতে পারেননি। তবে শিল্পের এই সুন্দরের সাথে বাস্তবের গভীর এবং অপ্রতিরোধ্য দ্বন্দ্ব ও নিরন্তর স্ববিরোধিতা নজরুলের রচনায় বর্তমান এবং সেটা তার অনুভূত অন্যতম সত্য। কবিরা সত্যদ্রষ্টা, জীবন-বাস্তবতার চিরায়ত সত্যের তারা সংবাহক, তাই সত্যদ্রষ্টা শিল্পীর সৃজনে থাকে মুক্তির আনন্দ, নজরুল লিখছেন: 'এই সত্যদ্রষ্টা স্বপ্নপথের পথিকেরা দারিদ্র্য-দুঃখ-শোক-ব্যাধি-উৎপীড়ন জর্জরিত মানবকে আনন্দের পথে মুক্তির পথে নিয়ে গেছেন।'[১৬]

সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক সত্য এককথায় উপনিবেশিত সময়ের সামগ্রিক বাস্তবতা আর শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে চর্চিত পাশ্চাত্য নন্দনতাত্ত্বিক সূত্রগুলো এক ধরনের টানাপড়েন সৃষ্টি করেছিল। উপনিবেশকালের লেখক হিসেবে অস্তিত্বের ঘোষণা নজরুলের সাহিত্যকর্মের ভেতরে রয়েছে, রয়েছে কিছু স্ববিরোধিতাও। কিন্তু নজরুল তাঁর রচনায় সর্বোপরি যে প্রত্যয় ঘোষণা

করেছেন তা স্পষ্ট, নির্ভীক এবং দৃঢ়; তাঁর সাহিত্য জীবনাভিজ্ঞতার সাহিত্য। 'স্বাধীন চিত্ততায় জাগরণ' (১৯৪০) অভিভাষণে জীবনের আনন্দ ও বেদনার সম্মিলিত অভিজ্ঞতাবোধের শিল্পিত প্রকাশ হিসেবে সাহিত্যকে চিহ্নিত করেন তিনি। জনগণমনসংলগ্ন সাহিত্যবোধে প্রাণিত তাঁর রচনা। 'জনসাহিত্য' (১৯৩৮) নামক অভিভাষণে আমাদের সাহিত্য বা সমাজনীতিকে টবের গাছের সাথে তুলনা করেছেন তিনি। মাটি সম্পৃক্ত জনমানুষের একজন হয়ে, তাদের প্রতি প্রাণের অনুভবকে সাহিত্যে রূপায়ণের কথা বলেন তিনি, যার নাম দেন জনসাহিত্য।

নজরুলের সাহিত্যচিন্তা সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য'। এ প্রবন্ধে বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিকদের শিল্পবোধ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ অত্যন্ত পরিষ্কার। এতে স্বপ্নচারী, বাস্তববাদী এবং এই দু'য়ের মধ্যবর্তী অবস্থানধর্মী হিসেবে সমকালীন সাহিত্যিকদের বিভক্ত করেছেন নজরুল। উল্লেখ করতে ভোলেননি সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিবাদী ধারার লেখকদেরও। এছাড়া এসব ধারা-সঞ্জাত অন্যসব গৌণধারা ও পাশাপাশি তাদের বৈশিষ্ট্যও নির্দেশ করেছেন তিনি। রোমান্টিক ধারায় জন মিল্টন (১৬০৮-১৬৭৪), শেলি (১৭৯২-১৮২২), ইয়েট্স (১৮৬৫-১৯৩৯), জন কিটস, লর্ড বায়রন (১৭৮৮-১৮২৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), নোগুচি (১৮৭৫-১৯৪৭) প্রমুখের নাম উল্লেখিত হয়েছে। মর্ত্যের সাহিত্যিক হিসেবে ফরাসি, স্পেনীয় বা ইউরোপীয় অনেক সাহিত্যিক যেমন– আনাতোল ফ্রাঁস (১৮৪৪-১৯২৪), বেনেভেন্তে মার্টিনেজ (১৮৬৬-১৯৫৪), বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০), এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২), জর্জ বার্নাড 'শ (১৮৫৬-১৯৫০), ওয়াল্ট হুইটম্যান (১৮১৯-১৮৯২), জোহান বোয়ার (১৮৭২-১৯৫৯) প্রমুখকে চিহ্নিত করেছেন নজরুল। বাস্তববাদী শিল্পী হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৭), দস্তয়েভস্কি (১৮২১-১৮৮১), ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬) এবং মিত্রি মেরেজকস্কির (১৮৬৬-১৯৪১) নাম। বিপরীতে রাশিয়ান সাহিত্যিক লিও তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০), আন্তন চেখভের (১৮৬০-১৯০৪) উল্লেখও আছে। নজরুল বাস্তববাদী ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী– এই দুই ধারার লেখককে মূলত বাস্তব ধারায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

কল্পনাপ্রধান রোমান্টিক সাহিত্য ও বাস্তবপ্রধান বা 'রিয়েলিস্টিক' সাহিত্যের মধ্যবর্তী সাহিত্যিকের মাঝে নজরুল উল্লেখ করেছেন নুট হামসুন (১৮৫৯-১৯৫২), ওয়াদিশল রেমন্ট (১৮৬৮-১৯২৫), লিওনিদ আঁদ্রিভ (১৮৭১-১৯১৯), গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দার (১৮৭৫-১৯৩৬) নাম। 'বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য' প্রবন্ধে মূলত উনিশ শতকের শেষ পাদের ও বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের বিশ্বসাহিত্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'কলকাতায় রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূলধারা এবং পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার ফলে নজরুল বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করে থাকবেন।'[১৭] নজরুলের মতে, 'স্বপন-বিহারী' রোমান্টিক সাহিত্যিকেরা কখনও ধরার মাটি স্পর্শ করে না। বিপরীতে 'মাটির পৃথিবীকে অপার মমতায় যাঁরা আঁকড়ে ধরে থাকেন তাদেরকে এই দুঃখের ধরণীর' অসুরতম সত্তার সাথে তুলনা করেছেন তিনি। নজরুলের প্রধান আক্ষেপ মানবতা ও মনুষ্যত্বের পদদলন নিয়ে, তাই অভিজাত স্বর্গবাসী সুরলোকের দেবতাসম শ্রেণির মানুষ ও সেই

শোষণব্যবস্থার বিপরীতে বিদ্রোহী শিল্পীর প্রতি তাঁর পরম আগ্রহ। এ কারণে গোর্কির উচ্চারণকে নজরুল উদ্ধৃত করেন, যা তাঁর আত্মগত বিদ্রোহ-প্রবণতা ও সমাজ-রাজনীতি ভাবনার সাথে সমান্তরালে বহমান।

সমকালীন বাস্তববাদী সাহিত্যধারার প্রধান লক্ষণ নির্ণয় করে নজরুল বলেন তাঁরা 'ধ্বংসব্রতী ভৃগুর মত বিদ্রোহী' যাঁরা রিফর্ম চান 'ইভোলিউশন দিয়ে নয়, একেবারে রক্তমাখা রিভোলিউশন দিয়ে।'[১৮] এই বিদ্রোহী সাহিত্যিকদের প্রতি ধনবাদী সমাজের ধারণাকে নজরুল তীক্ষ্ণভাবে বিদ্রূপ ও প্রত্যাখ্যান করেছেন:

> দশ মুণ্ড দিয়ে খেয়ে বিশ হাত দিয়ে লুণ্ঠন করেও যার প্রবৃত্তির আর নিবৃত্তি হল না, সেই Capitalist রাবণ ও তার বুর্জোয়া রক্ষা-সেনারা এদের বলে হনুমান।... সীতার উদ্ধারে যায় যে তথাকথিত হনুমান, রক্ষা-সেনা দেয় তার লেজে আগুন লাগিয়ে। তথাকথিত হনুমানও বলে, ল্যাজে যদি আগুনই লাগালি, আমার হাতমুখ যদি পোড়েই– তবে তোর স্বর্ণলঙ্কাও পোড়াব– বলেই দেয় লম্ফ।
>
> আজকের বিশ্ব-সাহিত্যে এই হনুমানও লাফাচ্ছে এবং সাথে সাথে স্বর্ণলঙ্কাও পুড়ছে[১৯]–

গত শতকের বিশের দশকে ভারতে বিশেষত বাংলায় রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যে ভাবধারা প্রসারিত হয়েছিল তার প্রতিফলন নজরুলের বিভিন্ন রচনায় সুস্পষ্টভাবে রয়েছে। উপনিবেশের নিগ্রহ, অমর্যাদা, পরাধীনতার গ্লানি ও দুঃখ নজরুলকে যেভাবে স্পর্শ করেছিল, তা নির্দিষ্ট কোনো মতবাদপুষ্ট রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার জন্য ঘটেনি; এটি তার নিজস্ব ও এর মূল্য শাশ্বত। বাস্তবধারী ধারার শিল্পীর কাছে নজরুল এই সমর্থনই খুঁজেছেন। লক্ষণীয়, 'বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য' প্রবন্ধের শেষে কিট্‌সের 'Ode to a Nightingale' কবিতার একটা উক্তি উদ্ধৃত করেছেন– 'Thou was not born for death, immortal Bird!' যা শিল্প-অস্তিত্বের অমরতার প্রত্যাশা বহন করেছে। ক্ষমতার পুঁজিনির্ভর লড়াই শোষক-শোষিতের চিরায়ত দ্বন্দ্ব, মানবতার চরম অবমাননা ও বিভীষিকাকে 'কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ির হোলি-খেলা' বলেছেন নজরুল, যখন তা চলে কিংবা চলেছে তখন এ 'ধূলার পৃথিবীতে' তাঁর আত্মিক অবসাদ ঘোচাতেই যেন স্বপ্ন রোমন্থনের মতো মানবের তথা শিল্পীর অমরত্বের গান শুনতে চান তিনি। এখানে তাঁর নির্দ্বন্দ্ব স্থিরচিত্তের আবাহন আছে, কেননা তাতে আছে গানের পরিসমাপ্তির বিরাট স্তব্ধতা ও অতলতা।

আত্মার নির্মাণ, প্রকাশ কিংবা নিরন্তর আত্মতার ঘোষণা নজরুলের নন্দনবোধের একটা অন্যতম দিক। এই 'আমি' এক অতিকায় সত্তায় পরিণত হয়েছে নজরুলের রচনায়। যার ঈশ্বরতুল্য বিশালতা, সর্বশক্তিময়তায় নিরন্তর ধ্বংস ও সৃজনের আবেগ তাঁকে সাধারণ পাঠক থেকে দূরে নিয়ে যায়। তাঁর আমিত্ববোধ অভিব্যক্তিবাদী তত্ত্বের অনুরূপ নয়, পাশ্চাত্য ব্যক্তিত্ব ভাবনার অসাধারণত্বের 'আমিত্ব'-ও নয়। তাঁর আত্মদর্শনের প্রকাশে আদ্যন্ত একটা বিদ্রোহ আছে, কোনো প্রকার ভাববাদী চেতনার দ্বারা যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। 'বিদ্রোহী' কবিতাই তাঁর এই আত্মতার শ্রেষ্ঠ ঘোষক। অনেকে এই আমিত্বের বোধকে বলেছেন 'দীপ্র ক্ষিপ্র প্রবল জীবনীশক্তিসম্পন্ন রোমান্টিক 'আমি'।'[২০] আত্মশক্তির উপলব্ধি, উদ্বোধন ও তার ঘোষণায় নজরুল প্রায় সর্বত্র তৎপর। 'আমার

পথ' প্রবন্ধে নজরুল লিখেছেন যে, নিজকে চিনলে এবং নিজের সত্যকেই নিজের কর্ণধার হিসেবে মানলে আত্মবিশ্বাস প্রবল হয়। তাঁর আমিত্ববোধ তথা সৃষ্টিসত্তার ক্ষমতা ও তাগিদটি সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মধ্যে পরিপুষ্ট হয়েছে। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'-তে বলেছেন– মানুষের 'অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশের জন্য' এবং 'অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য' কবি ভগবান কর্তৃক প্রেরিত, যার কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। ১৯৪১ সালের ১৬ মার্চ বনগাঁ সাহিত্য-সভার সভাপতির ভাষণে নজরুল বলেন– 'আমার সাহিত্য-সাধনা বিলাস ছিল না। আমি আমার জন্মক্ষণ থেকে যেন আমার অস্তিত্বকে, existence-কে খুঁজে ফিরেছি।'[২১] কিন্তু তিনি এও জানেন– পূর্ণভাবে সৃষ্টিকে প্রকাশ করে দেওয়ার শক্তি কোনো স্রষ্টারই নেই। তাই বলেন, 'মানুষ অপ্রকাশকে আপন মনের পূর্ণতা দিয়ে পূর্ণ করে দেখে।'[২২] এ বক্তব্যে জীবনবোধের ব্যাপকতায় আত্মপ্রকাশের জ্ঞানগত তাগিদ ও সম্ভাবনা পরিস্ফুট হয়েছে। এক প্রতিবাদী অহং চেতনার যে প্রতিধ্বনি নজরুলের রচনায় দেখি, তা কেবল সমকালীন শিল্প-সাহিত্যবোধের ক্ষেত্রেই নতুন নয়, উত্তরকালের পাঠকের মধ্যেও মানুষের ভেতরে সঞ্চিত অমিতশক্তি সম্পর্কে এক চিরায়ত সত্যবোধ সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছেন তিনি। ফলে এই আত্মপ্রকাশ মানব প্রকাশেরই নামান্তর। নজরুল তাঁর স্বাতন্ত্র্যের জয় ঘোষণা করেছিলেন ১৯২৯-এ; 'নজরুল সংবর্ধনা সমিতি' যখন কবিকে 'জাতীয় কবি' অভিধায় ভূষিত করে, নজরুল তখন 'প্রতিভাষণে' বলেন : 'কোনো অনাসৃষ্টি করতে আসিনি আমি। ... বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরই অভিযান-সেনাদলের তূর্যবাদকের একজন আমি– এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়।'[২৩]

নজরুলের 'আমার সুন্দর' প্রবন্ধটি তাঁর শিল্পভাবনার একটি অনন্য স্মারক। সুন্দরের স্বরূপ ও বিচিত্র নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ নজরুলের এ প্রবন্ধটিকে সমালোচক আখ্যা দিয়েছেন 'Aesthetic autobiography'[২৪]। এ প্রবন্ধটি নজরুলের আত্ম-অন্তর্ভূত 'সুন্দর' অনুধাবন ও অভিযাত্রার এক অতি মনোময় পরিক্রমা। শক্তি-সুন্দর, স্নেহ-সুন্দর, যৌবন-সুন্দর, প্রেম-সুন্দর, প্রলয়-সুন্দরের মতো মানবসত্তায় বিকীর্ণ বহু অনুভব নজরুল এ প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন। প্রলয়-সুন্দরকে নিজের 'পূর্ব চেতনা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। এ সম্পর্কে সমালোচকের মত:

> বিষয়টির ব্যাখ্যায় ও প্রতীকায়নে নজরুল ইসলামের দর্শনমনস্ক অধ্যাত্মবোধ স্পষ্ট। নজরুল বলেছেন যে, তাঁর লক্ষ্য পরম সুন্দরের পরম বিলাস কিন্তু তা কেবল ধ্যানের মাধ্যমে অর্জন করা যাবে না। ধ্যানের মধ্যে দিয়ে ঊর্ধ্বলোকে যাত্রা সম্ভবপর হলেও, অসুর আর অশুভের সঙ্গে লড়াই ছাড়া সে যাত্রা সফল হবার নয়। পরম সুন্দরের দেখা পেতে হলে মাটির পৃথিবীর ঋণ শোধ করতে হবে। বাংলার ঋণ শোধ করতে হবে। অর্থাৎ উপনিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। আর সেকারণেই, নিবন্ধের শেষে তিনি বলেছেন প্রলয়-সুন্দরই তার কাম্য।[২৫]

সুন্দরের এই চেতনা নজরুলের জীবন ও শিল্পবোধের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তাঁর নান্দনিক বোধের গড়ন সম্পর্কে সমালোচক বলেন:

> Every occurrence in his personal life as well as socio-political in the country turned into an aesthetic experience to him, which is why he started expressing himself eloquently in his writing and speaking and singing … his personal life, the socio-political life, the life

of a creative artist– all mingled together to render his living into an interdisciplinary discourese.[২৬]

'আমার সুন্দর' প্রবন্ধে নজরুলের অভিব্যক্তি থেকে তাঁকে ভাববাদী শিল্পতাত্ত্বিক হিসেবে চিহ্নিত করা কঠিন নয়। কেউ কেউ তা করেছেন:

সৃষ্টিতে, পৃথিবীতে, আকাশে, বাতাসে, রসভরা ফলে, সুরভিত ফুলে, স্নিগ্ধ মৃত্তিকায়, শীতল জলে, সুখদায়ী সমীকরণে এবং জগৎ সৃষ্টির সমগ্রতায় কবি 'সৃষ্টি-সুন্দর'কে অনুভব করেন। কবি আত্মযন্ত্রণাময় ও সংক্ষুব্ধ অবস্থা থেকে উত্তরিত হয়ে পরম পূর্ণতা ও পরম শান্তির স্নিগ্ধ আনন্দময়তায় অবগাহন করে নান্দনিক তৃপ্তি লাভ করেন।[২৭]

এই প্রবন্ধে সুন্দরের রূপ-রূপান্তরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে আত্মতা ও স্বরূপের উপলব্ধি। সর্বশেষ অভিভাষণে ('যদি আর বাঁশি না বাজে') নজরুল বলেছিলেন 'অভেদ-সুন্দর-সাম্য'-এর কথা। সুতরাং সুন্দরের যে চেতনা প্রথাগত নন্দনতত্ত্বের ভিত্তি, 'তার সঙ্গে নজরুলের সৌন্দর্যচিন্তার লক্ষযোগ্য স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।'[২৮]

নজরুলীয় নন্দনতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস তাঁর সংগীত। প্রায় একযুগের মতো (প্রস্তুতিপর্বসহ আরো ৪/৫ বছর) সংগীতের সাধনায় ব্যয় করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম এবং 'নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দর্যসৃষ্টির সমস্ত হিসাব নিকাশ তিনি চুকিয়ে মিটিয়ে দেন তাঁর সুর ও সঙ্গীতে। নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে, সে কারণে নজরুল ইসলাম একজন চরিতার্থ শিল্পী।'[২৯] সংগীতচর্চাকে তিনি বলেছেন 'গানে গানে প্রাণের আলাপ'[৩০] কিংবা 'সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ করে দেখার স্তবস্তুতি।'[৩১]

নজরুলের বিভিন্ন শ্রেণির গান রয়েছে– প্রেম ও প্রকৃতি-প্রধানবিষয়ক গান, রাগ-প্রধান ইসলামি গান, ভক্তিগীতি, গজল, লোকগীতি, শ্যামাসংগীত, দেশাত্মবোধক গান, হিন্দি গান, গীতিনাট্য ইত্যাদি। প্রায় তিন হাজার গানের রচয়িতা তিনি। শিল্প-সাহিত্যের সবচেয়ে ব্যঞ্জনাময় ও অনুভবভেদ্য নান্দনিক শাখা এই সংগীত সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিমত হলো:

কাব্য ও সাহিত্যে আমি কী দিয়েছি জানি না। আমার আবেগে যা এসেছিল, তাই আমি সহজভাবে বলেছি, আমি যা অনুভব করেছি, তাই আমি বলেছি, ওতে আমার কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু সঙ্গীতে যা দিয়েছি সে সম্বন্ধে আজ কোনও আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে, তখন আমার কথা সবাই স্মরণ করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। সাহিত্যে দান আমার কতটুকু তা আমার জানা নেই। তবে এইটুকু মনে আছে সঙ্গীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি।[৩২]

বিষয় ও সুরে নজরুলসংগীত বাংলা গানের এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর সংগীতের নন্দনতত্ত্ব মূল্যায়নও তাই জরুরি। নজরুল-সংগীত আদ্যন্ত জীবনময়, রোমান্টিকতাপূর্ণ এবং শ্রুতিনন্দন এক নান্দনিক অভিজ্ঞতায় আভাসিত। সমকালে ব্রিটিশ দার্শনিক নিক জ্যাঙউইল (১৯৫৭) তাঁর *Music and Aesthetic Reality : Formalism and the Limits of Description* গ্রন্থে লেখেন :

By 'realism' about musical experience, I mean a view that foregrounds the *aesthetic properties* of music and our experience of these properties: musical experience is an awareness of an array of sounds and of the aesthetic properties that they determine.

> Our experience is directed onto the sound structure and its aesthitic properties. This is the content of musical experience.[৩৩]

অধুনা সমালোচনাতত্ত্বে সংগীত কেবল স্বাধীন স্বাবলম্ব শিল্প হিসেবে নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সংগীতের জন্ম ও বিকাশের ঐতিহাসিকতা; এর সাথে সম্পৃক্ত সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতও। নজরুল সংগীতের পাঠও এই সূত্রে বিবেচ্য, কেননা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিল্পী হিসেবে তাঁর আত্মবিকাশের ইতিহাস, তাঁর অভিজ্ঞতাময় শিল্পতত্ত্ব।

গ.

শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে নজরুলের মত, তাঁর সাহিত্যকর্মের ধরন, ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য, সমকালে তাঁর সৃষ্টিকর্মের মূল্যায়নে দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য এবং উত্তরকালে কিংবা বর্তমানে নজরুলের সৃষ্টিসম্ভার এবং তাঁর নন্দনতত্ত্ব যাচাইয়ের প্রয়োজনটি যুগচেতনার সাথেই গভীরভাবে সম্পৃক্ত। নজরুলের নন্দনতাত্ত্বিক দর্শন বিচারে স্বভাবতই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নন্দনতত্ত্বের ইতিহাস ও পর্যালোচনার ধারা আলোচ্য হয়ে ওঠে। তবে এ পদ্ধতির নানা প্রতিবন্ধকতা আছে বলে অধুনা অনেক সমালোচক মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ নজরুল নন্দনতত্ত্ব কোনো পূর্ব ধারণা বা মডেলের নিরিখে বিচার্য নয়– 'কারণ নজরলের নান্দনিকতার একটি নিজস্ব উত্থানপর্ব আছে, এবং সেই উত্থানপর্বের বিরাট অংশ জুড়ে আছে উপনিবেশ ও তার ডিসকোর্স'।[৩৪] তাছাড়া 'নজরুল ইসলাম কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রণোদনা থেকে নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন নি। যা বোধ করেছেন, তা-ই সুযোগ সুবিধে মতো তিনি বলেছেন। এসব বক্তব্য তাঁর অভিভাষণগুলোতেই বেশি পাই।'[৩৫] তবে তাঁর নান্দনিক প্রত্যয় অনুসন্ধানে এ কথা বলা যায় যে, নজরুল কোনো 'তত্ত্বীয় নন্দনতত্ত্ব সংগঠনে ব্রতী হননি।'[৩৬]

মূলত নন্দনতত্ত্বের একেক ঘরানা চায়, লেখকের সৃষ্টিকে নিজ ঘরানার আলোকে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা করতে, গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করতেও। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, *দোলনচাঁপা* (১৯২৩), *ছায়ানট* (১৯২৫) এবং *সর্বহারা* (১৯২৬) কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে সমালোচকের বিরূপ মন্তব্যের কারণে নজরুল বলেছিলেন– 'আমি আর্টের সুনিশ্চিত সংজ্ঞা জানি নে, জানলেও মানিনে।'[৩৭] সমালোচকের অবমূল্যায়ন তাঁর শিল্পীব্যক্তিত্বকে আহত করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এর বিরূপতা সৃজনশক্তি সম্পর্কে তাঁর আত্মবিশ্বাসকে খর্ব করেনি মোটেও। 'নিন্দুকের শর নিক্ষেপে' তাঁর সৃষ্টিকর্ম 'মুহূর্তের তরে আড়াল পড়লেও চিরদিনের জন্য ঢাকা পড়বেনা।'[৩৮] – নজরুলের এই মন্তব্য এর একটা প্রমাণ। তাই 'কবি ও অকবি' যা-ই বলা হোক, তিনি মুখ বুজে সইতে চেয়েছেন। উল্লেখ্য যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'প্রগতি' পত্রিকা এবং কাজী নজরুল ইসলামের সাথে 'শনিবারের চিঠি'র একটা বিরোধ ছিল, যার বড় অংশ জুড়ে আছে নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তার বৈপরীত্য তথা বিরোধ। সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের কাছে সমকালীন সাহিত্য নিয়ে যত অভিযোগ-নালিশ করেছেন তার মাঝে সমকালীন এসব পত্রিকার প্রসঙ্গ ছাড়াও থাকত নজরুলের কবিতা সম্পর্কিত আলাপ। তাঁর দুর্ভাগ্য এই যে, ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্বে তাঁর

কবিতা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মূল্যায়নের শিকার হয়েছে। তাঁর জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ, মানবতাবাদ, সাম্যবাদ, মার্কসবাদ, ইসলামিয়ানা, হিন্দুয়ানা, রাজনীতি-মুখরতা 'ইত্যাকার বিবিধ প্রসঙ্গ উৎসাহী গবেষক–সমালোচকের সহজ চর্চাক্ষেত্র। ... নজরুলের এতোসব সামাজিক-রাজনৈতিক বিবেচনার আড়ালে প্রায় হারাতে বসেছে তাঁর অন্তরাশ্রিত এক ভিন্নমাত্রার নান্দনিক স্রষ্টার পরিচয়। পরিমাপ করা হচ্ছে না তাঁর নান্দনিক প্রসারতা, উচ্চতা ও গভীরতা।'[৩৯] একথা সত্য যে উপনিবেশ পর্বে সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে নজরুল গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছেন, কখনও ধর্মীয় আধ্যাত্মিক ব্যাপারে মগ্ন হয়েছেন, বিপ্লববাদেও তিনি ঝুঁকেছিলেন, উদ্বোধিত হয়ে সাম্যবাদে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন– 'কিন্তু কোথাও নোঙর ফেলেননি।'[৪০] এ পর্যায়ে সমগ্র নজরুল সম্পর্কে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৯২০-১৯৮৫) মূল্যায়ন :

> কোনো বিশেষ দলের রাজনৈতিক মতবাদ কোনো শিল্পী কবিকেই সম্পূর্ণ হবার উপকরণ দেয় না, বরং তার সৃষ্টিকর্মের বৃহত্তর পটভূমিকে বারবার সংকীর্ণ করে এবং দলবহির্ভূত সমস্ত চেতনা ও উপলব্ধির সৌন্দর্যই তাঁর দৃষ্টি থেকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করে। সমস্ত দেশের অন্তরকে একটি সুরে জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা সেই কবিরই থাকে, যিনি আয়নার মতো নিজের হৃদয়ে স্বদেশীয় সমস্ত মত চেতনার ও আদর্শের ছবিগুলি ধরে রাখতে জানেন, এবং তা থেকে সম্পূর্ণ ও অপরূপ চিত্রের সৃষ্টি করেন। এই কাজ ও ক্ষমতা তাঁর কোনো কুশলী দক্ষতা নয়; একটি কবির ধ্যানস্থ হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রতিফলন। উনিশশো উনিশ থেকে তিরিশের যুগ পর্যন্ত নজরুল ছিলেন মুক্তিকামী ভারতবর্ষের সকল সাধনা, সকল আরাধনার দর্পণ।[৪১]

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই বিশ্লেষণ নজরুলের সমকালচেতনা, তাঁর অভিজ্ঞতার ভাষ্য নির্মাণ ও এর স্বাতন্ত্র্যকেই নির্দেশ করে। শিল্পীর বোধের সাথে তার অতীত বর্তমান এবং অনাগতের এক যৌথ সম্ভাবনা নির্মিত হয়। নজরুল ক্রমাগতই তাঁর সংবেদনশীলতায় যুগপৎ দ্বন্দ্ব এবং কালজ ও কালোত্তরের বিনিময়ের অনিবার্য মাধ্যম হয়ে ওঠেন।

শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে নজরুলের বৈচিত্র্যময় অভিমত বিশ্লেষণ করে বলা যায়, শিল্পের কিছু স্থায়ী গুণ (যা সৃজনের আবেগের সাথে সম্পর্কিত) এমন কিছু নান্দনিক অনুভবের জন্ম দেয়, যা একজন শিল্পীর ক্ষেত্রে তাঁর সত্তা-সজ্জা-অভিজ্ঞতালোকের মূল্যায়নে আগ্রহী করে তোলে। শিল্পের এই স্বভাবজ ঔৎসুক্য থেকে নজরুল কিছু বিশ্লেষণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, সেটা তাঁর নন্দনসূত্র নির্মাণে সহায়ক এবং প্রাসঙ্গিকও। এসব সিদ্ধান্তের অনেকগুলোই সমকালীন নন্দনতত্ত্ব চর্চার সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিশেষত– শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা, উদ্দেশ্য, সৌন্দর্যের ধারণা, সত্য-সুন্দর-মঙ্গলবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে মন্তব্যে এক ধরনের নান্দনিক তৃপ্তিও অনুভব করেছেন নজরুল। উল্লেখ্য যে, নজরুল সমকালে রোমান্টিক, আধুনিকবাদী ও বাস্তববাদী শিল্পী এমনকি ধনবাদী, ফ্যাসিস্ট তথা সাম্রাজ্যবাদী সাহিত্যিকের রচনাকর্ম ও সাহিত্যতত্ত্বের সাথে পরিচিত হয়েছেন– কিছু স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও 'বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য' প্রবন্ধে এ বিষয়ে স্বচ্ছ আলোচনা আছে। শিল্পকে জাতগোত্রহীন ভাবা এবং শিল্পীর ক্ষমতা ও কর্মকে দেশ-কাল-জাতি নির্বিশেষে কালাতিক্রমী করে তোলা তাঁর নান্দনিক আকাঙ্ক্ষার অংশ বলে ভাবা যায়।[৪২] বিশের দশকে তরুণ মুসলিম সাহিত্যিকদের প্রতিনিধির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নজরুল তাদেরকে উৎসাহী করে তুলতে চেয়েছেন 'প্রাণ,

চিন্তাশক্তি ও ভাবময়তায় পূর্ণ, স্থায়ী সাহিত্য' সৃজনে। শিল্প-সাহিত্য সৃজনে শিল্পী হয়ে ওঠার চেয়ে তার সাহিত্যতাত্ত্বিক সম্ভাবনাকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক দর্শনকে যুগপৎ বস্তুবাদী ও ভাববাদী নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা তথা জীবনবাদী ও শিল্পবাদী নন্দনচিন্তার সংশ্লেষ বলে মনে করেছেন কেউ কেউ। তবে উপনিবেশিত সময়ের সমাজচিত্র, রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে যুক্ত এবং আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার প্রশ্নে আমূল আপোশহীন কবির টানাপড়েন এবং শেষপর্যন্ত সৃজনে ও ঘোষণায় ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের সাথে স্পষ্ট বিদ্রোহ এবং বিচ্ছিন্নতাই নজরুলীয় নন্দনতত্ত্বের ভিন্ন বয়ান তৈরি করে। ফলে তাঁর নন্দনতত্ত্ব হয়ে ওঠে রাজনৈতিক নন্দনতত্ত্ব। নজরুল রাজনৈতিক বিষয়কে গভীর আবেগের দ্বারা উত্তপ্ত করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর নন্দনতত্ত্ব রাজনৈতিক, তা নয়। মূলত নন্দনতত্ত্ব ও রাজনীতির মধ্যে রয়েছে এক গভীর অন্তর্বয়িত সম্পর্ক। তাছাড়া মহৎ শিল্পীর নান্দনিক অভিজ্ঞতা মূলত গভীরভাবে 'রাজনৈতিক'। সুতরাং সমকালীন পাঠে তাগিদ তৈরি হয় নতুন প্রকল্পে নজরুলের নান্দনিক অভিজ্ঞতার মূল্যায়নের। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন :

> নজরুল ইসলাম নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে সুশৃঙ্খলভাবে যে কিছু লিখতে বা বলতে পারতেন না, এমন নয়। কিন্তু যখনই তিনি সৌন্দর্য ব্যাখ্যার সূক্ষ্মতর স্তরে প্রবেশ করতে চেয়েছেন, তখনই সমকালীন সমাজের হিন্দু-মুসলিম ডায়ালেক্টিকের বিভিন্ন বাস্তবতা তাঁকে আক্রমণ করেছে। ... তাঁর অভিভাষণগুলোর একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে হিন্দু-মুসলিম সংঘাত ও সম্প্রীতির প্রসঙ্গ। তাছাড়া যে কালে তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন, তখন বাংলা ছিল উপনিবেশের অন্তর্গত ... যখন পুরো ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশ কলোনির অন্তর্গত। উপনিবেশ ও রাজনৈতিক পরাধীনতাকে কাজী নজরুল ইসলাম প্রধানতম শত্রু হিসেবে শনাক্ত করেন সাহিত্যজীবনের একেবারে সূচনালগ্ন থেকে। এসব বিবিধ বিষয় নজরুলকে বিশুদ্ধ নান্দনিকতা ও সৌন্দর্যোপলব্ধিতে বার বার বিঘ্ন ঘটিয়েছে। ব্রিটিশ কলোনির সাংস্কৃতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে নজরুলের নান্দনিকতার পুনর্মূল্যায়ন তাই আজ আবশ্যক।[৪৩]

নজরুলের সাহিত্যকর্ম এবং তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক মতাদর্শ প্রকারান্তরে কলোনি ও এর ডিসকোর্সের বিরোধিতাই করেছে। এ প্রসঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচক-মত হলো:

> বাংলা সাহিত্যে নজরুলই বোধ করি সবচেয়ে লড়াকু উপনিবেশবাদ-বিরোধী লেখক যাকে সামান্যতম ঔপনিবেশিক হীনম্মন্যতা স্পর্শ করেনি, যার স্বার্থতাড়িত ঔপনিবেশিক টানাপোড়েনের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৪৪]
>
> সামগ্রিকভাবে নজরুলের যে রাজনৈতিক পক্ষ ও সক্রিয়তা– গণতন্ত্রের, গণমুক্তির, স্বাধীনতার ও অসাম্প্রদায়িকতার, তার প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন।[৪৫]

সুতরাং আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দর্শনের আলোকে নজরুলের সাহিত্যকর্ম ও দর্শনের বিশ্লেষণ আয়াসসাধ্য নয় বলে কেউ কেউ মনে করেন। তার কারণ ব্যাখ্যা করে সমালোচক লিখেছেন:

> নজরুল কতগুলো শব্দ তাঁর সৃষ্টিধর্ম ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহার করেছেন– যেমন, সুন্দর, প্রেম, সৈনিকতা, বিদ্রোহ, বিপ্লব, যৌবন ইত্যাদি। ... নজরুল কোনো প্রভাবশালী ডিসকোর্স মেনে চলেননি, নিয়েছেন কতগুলো 'ডিসকার্সিভ এলিমেন্ট', যেগুলো সমকালীন ও স্থানীয় বাস্তবতার প্রচণ্ড চাপে নতুনভাবে রূপায়িত হয়েছে। যেমন, তিনি স্বাধীনতা, বিপ্লব, যৌবন, মানুষ– এই ধারণাগুলো অনবরত ব্যবহার করেছেন। ধারণাগুলো

> পুরোপুরি অপশ্চিমা– এমন বলা যাবে না। কিন্তু সেগুলো পশ্চিমা ডিসকোর্সের আধিপত্যের মধ্যে, শৃঙ্খলা ও শিক্ষার সীমার মধ্যে রূপায়িত না হওয়ায় একটা নতুন রূপে হাজির হয়।[৪৬]

নজরুলের বিদ্রোহ, বিপ্লববোধ, স্বাধীনতার চরম আকাঙ্ক্ষা, সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি বিষয়ে তাঁর অসহিষ্ণু প্রতিবাদ-মুখরতা, উপনিবেশিত সময়ে দেশীয় রাজনীতির অসারতা সম্পর্কে আক্ষেপ, স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী মানবত্বের চেতনা, তাঁর প্রেমবোধ সর্বোপরি সাহিত্যিকের স্বাধিকার, কর্তব্যবোধ ও সাহিত্যের ক্ষমতায় বিশ্বাস– এই সবেরই সমন্বয়ে সংগঠিত হয় তাঁর স্বতন্ত্র নন্দনতাত্ত্বিক বয়ান। যে নান্দনিক প্রত্যয় কিংবা বীক্ষণ সমকালের চলমানতার অংশীদার হয়েও বিশেষ এবং নৈর্ব্যক্তিক। নজরুলের বিদ্রোহের একটা বিচিত্র রূপ আছে এবং তার মধ্যে একটা মৌলিক ঐক্য ছিল, যেটা নজরুল তার 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'তে বলেছেন। 'গণ'কে সমাজের প্রাণকেন্দ্র রূপে প্রত্যক্ষ করা যে সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সেই 'গণচেতন সাহিত্য সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য সকল গুণ তাঁর ভেতরে ছিল।'[৪৭] 'নির্যাতনের জাতি নাই, পীড়িতের নাই জাতি ও ধর্ম'– এরকম আরও অসংখ্য প্রত্যয় তাঁর মানবতার দর্শনকেও পৃথক করেছে এবং 'নজরুলের "মানবতাবাদ" পশ্চিমা "লিবারেল হিউম্যানিজমের"র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।'[৪৮] এছাড়া উপনিবেশায়নের প্রতিক্রিয়ার ফল যে জাতীয়তাবাদী চেতনা– তার থেকে নজরুলের রাষ্ট্রচিন্তা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সর্বোপরি নন্দনচিন্তার বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। ফলে তাঁর সাহিত্যকর্মকে প্রতিরোধের সাহিত্য এবং নন্দনতত্ত্বকে 'প্রত্যাখ্যানের নন্দনতত্ত্ব'[৪৯] বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্যকর্মের ভাষা-বিবেচনাও খুব গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে রয়েছে সাংস্কৃতিক মতাদর্শ ও রাজনীতির প্রশ্ন, সমালোচক বলেন :

> উত্তর-ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স ও সাহিত্যসৃষ্টিতে নজরুলের অপ্রতিরোধ্য ভূমিকা একারণেই আজ গুরুত্বপূর্ণ। কাজী নজরুল ইসলাম যে ভাষা সৃষ্টি করেছেন এবং তার মধ্যে বিচিত্র সমকালস্পর্শী পুরাণ ও অসামান্য বাক্‌প্রতিমার বিন্যাস করেছেন, তা তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যায়নের জন্য অতীব জরুরি।[৫০]

তাই ব্যক্তি কিংবা সাহিত্যের ভাষা হয়েও নজরুলের ভাষা 'জীবন নামক এক ব্যাপকতার ভাষা'।[৫১] যদি তাঁর সাহিত্য হয় 'প্রতিরোধের সাহিত্য', তাহলে তাঁর বিকাশ ও নির্মাণের ধরনকে কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্বের আওতায় বিচার করা সমীচীন নয়। কেননা বিশেষ রাজনৈতিক-দার্শনিক মত অথবা প্রচলিত-চর্চিত যে কোনো মতবাদের অনুগামী হিসেবে ভেবে নিলে নজরুলের সমগ্র শিল্পীব্যক্তিত্ব বিশেষত তাঁর নান্দনিকতার দর্শন খণ্ডিত হয়ে যায়।

নজরুলের নন্দনতত্ত্ব আসলে জনমানুষের নন্দনতত্ত্ব– যার মধ্যে পূর্বাপর অস্তিত্বশীল থাকে স্বয়ম্ভু শিল্পীব্যক্তিত্ব, ঐতিহ্যানুগ চলমানতা ও স্বতশ্চল বিদ্রোহের যুগপৎ প্রত্যয়, লোকসত্তার সপ্রতিভ, স্বতঃস্ফূর্ত সম্পৃক্তি, সময় ও বৃহৎ মানবের উত্তরণ-স্পৃহা সর্বোপরি মানুষের সর্বজনীন সার্বভৌমত্ব। এছাড়া নজরুল নিজেকে তাঁর সৃজনকর্মের মধ্য দিয়ে এমনভাবে গণ্ডির বাইরে নিয়ে গেছেন, যা তাঁর ব্যক্তিত্বের চূড়ান্ত প্রকাশ বা প্রসার ঘটিয়েছে– শিল্প সৃজন কিংবা শিল্পচেতনায় নিজেকে বিকশিত ও প্রসারিত করার এই উচ্চতর প্রক্রিয়া থেকে নজরুলকে 'নান্দনিক অস্তিত্ববাদী' হিসেবে

চিহ্নিত করা সম্ভব। অস্তিত্ববাদী অর্থে তাঁর শিল্প-সৃজন আত্ম-অতিক্রমণের পথও নির্মাণ করে, যা তাঁর স্বাধীন, অস্তিত্বশীল সারসত্তার রূপকার হয়ে ওঠে। নজরুল এভাবেই ক্রমাগত সৃষ্টি করেছেন তাঁর আপন নন্দনতত্ত্বের জগৎ; তাই নজরুলের নন্দনতত্ত্ব পাঠের বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা ও সমকালে তা চর্চার প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করা যায় না।

তথ্যনির্দেশ

১ সূত্র: Oxford Languages, URL: languages.oup.com

২ 'সৌন্দর্যতত্ত্বের উদ্ভব প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে ব্যাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ এবং চীনের দাস প্রধান সমাজে লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে গ্রীসের হেরাক্লিটাস, সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল এবং অপরাপর দার্শনিক রচনায় সৌন্দর্যতত্ত্বের জটিলতর বিকাশের সাক্ষাত পাই। প্রাচীন রোমের দার্শনিক লুক্রেশিয়াস এবং হোরেসও সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।' সরদার ফজলুল করিম, *দর্শন কোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৩, পৃ. ১৬

৩ 'It is clear from this history that aesthetic, with its specialized references to ART, to visual appearance, and to a category of what is 'fine' or 'beautiful', is a key formation in a group of meanings which at once emphasized and isolated SUBJECTIVE sense-activity as the basis of art and beauty as distinct, for example, from *social* or *cultural* interpretations. It is an element in the divided modern consciousness of art and society: a reference beyond social use and social valuation which, like one special meaning of culture, is intended to express a human dimension which the dominant version of *society* appears to exclude.' Raymond Williams, *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society*, Oxford University Press, New Work, 1985, p. 15

৪ নব্য-ধ্রুপদীবাদ বা নন্দনভাবনা বলতে আঠারো ও উনিশ শতকের ইউরোপের আলংকারিক ও দৃশ্যগত শিল্পকলা, থিয়েটার, সংগীত এবং স্থাপত্যশিল্পকে ঘিরে এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বোঝানো হয়ে থাকে। নব্য-ধ্রুপদী সাহিত্যতচিন্তা অনুযায়ী বিশুদ্ধ শিল্পকলা মূলত যুক্তি ও আনুশাসনিক শৃঙ্খলার অধীন।

৫ বিনয়কুমার মাহাতা, 'এলিয়ট, ইয়েটস ও বোদলেয়ার', *নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা* (তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০৮, পৃ. ১০৪

৬ ক্যাথারিন এভারেট গিলবার্ট ও হেলমুট কুন, *নন্দনতত্ত্বের ইতিহাস* (শফিকুল ইসলাম অনূদিত), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ২০২২, পৃ. ৫৫৯

৭ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র* (মুহম্মদ নূরুল হুদা ও রশিদুন্ নবী সম্পাদিত) নজরুল ইনস্টিটিউট, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ৩১

৮ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৯ প্রাগুক্ত

১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

১১ প্রাগুক্ত

১২ প্রাগুক্ত

১৩ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ৩৭৬

১৪ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১

১৫ প্রাগুক্ত

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯

১৭ আবু হেনা আবদুল আউয়াল, *নজরুলের সাহিত্যচিন্তা ও তাঁর সাহিত্য*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা ২০১০, পৃ. ১০৮
১৮ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪
১৯ প্রাগুক্ত
২০ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'নজরুলের কবিতায় আত্মসম্বোধন ও আত্মঘোষণা', *নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা (বিশেষ সংখ্যা)*, [মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত], নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা ২০০১, পৃ. ৪০৭
২১ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪
২২ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
২৩ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুলের অভিভাষণ*, কবি নজরুল ইনিস্টিটিউট, ঢাকা ২০১৮, পৃ. ১২-১৩
২৪ Mohammad Nurul Huda, *Nazrul's Aesthetics and other aspects*, Nazrul Institute, 1st edition, Dhaka 2001, p. 25
২৫ সালাহউদ্দীন আইয়ুব, *নজরুল-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ২৩
২৬ Mohammad Nurul Huda, *Nazrul's Aesthetics and other aspects*, ibid, p. 36
২৭ রহমান হাবিব, *নজরুল নন্দনতত্ত্ব: পুনর্গঠন ও সূত্রায়ণ*, নবযুগ, ঢাকা ২০০৫, পৃ. ৭৮
২৮ মুহম্মদ নূরুল হুদা, 'নজরুলের নান্দনিকতা প্রসঙ্গে', *নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংখ্যা* (মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত), নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ. ১২৯
২৯ সালাহউদ্দীন আইয়ুব, *নজরুল-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
৩০ কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা (০৮/০/১৯২৮) একটা চিঠিতে নজরুল লিখছেন– 'কোলাহল অনেক করেছি, এইবার গানে গানে প্রাণের আলাপ।' উদ্ধৃত, কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯১
৩১ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১
৩২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০
৩৩ Nick Zangwill, *Music and Aesthetic Reality: Formalism and the limits of description*, Routledge 2016, p. 20
৩৪ সালাহউদ্দীন আইয়ুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৩৬ মুহম্মদ নূরুল হুদা, 'নজরুলের নান্দনিকতা প্রসঙ্গে', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭
৩৭ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৬
৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭
৩৯ মুহম্মদ নূরুল হুদা, 'নজরুলের নান্দনিকতা প্রসঙ্গে', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪
৪০ আবদুল মান্নান সৈয়দ, *কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ* (আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত), অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা ২০১৮, পৃ. ৩০
৪১ উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
৪২ নজরুল লিখেছেন: 'আমি মুসলমান– কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের, সকল কালের এবং সকল জাতির। কবিকে হিন্দু-কবি, মুসলমান কবি ইত্যাদি বলে বিচার করতে গিয়েই এত ভুলের সৃষ্টি।' উদ্ধৃত, কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭১। এছাড়া নান্দনিকতার দর্শন বা ধর্মীয় মতাদর্শের সাথে বিরোধ অনুভব করে সমকালে যেসব অভিযোগ তাঁকে করা হয়েছিল, তার জবাবও দিয়েছেন নজরুল। ১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতা এলবার্ট হলে হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ থেকে বিপুল সমারোহে সংবর্ধিত হন তিনি। সেখানে দেয়া প্রতিভাষণে তিনি বলেছিলেন : 'যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেন তাদের মত হলুম না বলে, তাঁদেরকে অনুরোধ, আকাশের পাখিকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের করে দেখেন। ... সুন্দরের ধ্যান, তার স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি।' কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুলের অভিভাষণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩
৪৩ সালাহউদ্দীন আইয়ুব, *নজরুল-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৪৪ আজফার হোসেন, 'আমাদের নজরুল ও গর্জে-ওঠা ত্রিমহাদেশীয় কাব্যতত্ত্ব', কালের খেয়া, ২৩ মে, ঢাকা ২০০৮
৪৫ মোহাম্মদ আজম, *কবি ও কবিতার সন্ধানে*, বাতিঘর, ঢাকা ২০২০, পৃ. ৯৫
৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮
৪৭ সুশীলকুমার গুপ্ত, *নজরুল-চরিতমানস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৩৮৪, পৃ. ৩৪১
৪৮ মোহাম্মদ আজম, *কবি ও কবিতার সন্ধানে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
৪৯ সালাহউদ্দীন আইয়ুব, *নজরুল-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৫০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
৫১ মুহম্মদ নূরুল হুদা, 'নজরুল ভাষা-বিদ্রোহঃ প্রস্তাবনা', *নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা- বিশেষ সংখ্যা* (মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত), নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা ২০০১, পৃ. ৫০৫